শেষ প্রণয়

মোরশেদা কাইয়ুমী

ইফফাহ্ পাবলিকেশন্স

শেষ প্রণয়
রচনা : মোরশেদা কাইয়ুমী
সম্পাদনা : শাহরিন রিশা

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ফাতেমাতুন নিসা
পৃষ্ঠাসজ্জা : উম্মে তাইমিয়া

প্রকাশনা : ইফফাহ পাবলিকেশন্স, পবা, রাজশাহী
ফোন : ০১৮৬৬-৫৬ ২৪ ৭২
ইমেইল : info.iffah@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই : জাহাপনা
ফোন : ০১৭৮৯-৮৫ ৪৬ ০২

একমাত্র পরিবেশক : ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
শপ#২১, কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৬৮-৮৬ ৪৪ ২৮

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ

মূল্য : ২৬০৳

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬৯-০-৯

এক.

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে জারিন। কর্দমাক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে পিচ্ছিল পাহাড়ি রাস্তায় পা ফেলছে টালমাটালভাবে, চোখে-মুখে আতংকের ছাপ স্পষ্ট। পেছনে তাড়া করছে এক ভয়ঙ্করদর্শন প্রেতাত্মা। তার নিঃশ্বাসের প্রতিধ্বনি যেন পাহাড়ের গা বেয়ে প্রতিফলিত হয়ে জারিনের বুকের ভেতর ধাক্কা দিচ্ছে।

চারপাশে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, প্রতিটি পদক্ষেপে যেন মৃত্যুর শীতল ছায়া তাকে ঘিরে ধরছে।

প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে পালানোর, আতঙ্কে জমে আসা তার হৃদয় একটাই কামনা করছে—জীবন।

এই অচেনা পথে সামনের দিকে ছুটে চলেছে জারিন, কোথায় যাবে জানে না, শুধু জানে থামলেই সব শেষ। ঘন অন্ধকারে ঢাকা এই পথের শেষ কোথায়, আদৌ কোনো শেষ আছে কিনা, সে জানে না—শুধু ছুটে চলেছে এক অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, যেখানে হয়তো তার মুক্তি, কিংবা আরও ভয়াবহ কিছু অপেক্ষা করছে।

গোধূলির শেষ বিকেলের নরম আলোয় জারিন আর নীরব হাত ধরে বেরিয়েছিল হাঁটতে। নিরিবিলি পথে দুজন পাশাপাশি হাঁটছিল, আর মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা না বলা কথাগুলো ধীরে ধীরে ভাগ করে নিচ্ছিল একে অপরের সাথে। কথার ফাঁকে, হঠাৎ করেই রাস্তার বিপরীত দিকে কিছু একটার দিকে চোখ পড়ে জারিনের। ভালো করে দেখার জন্য সেদিকে তাকাতেই সে টের পায়—নীরব আর তার পাশে নেই। যেন মুহূর্তের মধ্যেই কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে!

পাগলের মতো চারপাশ খুঁজতে থাকে জারিন, কিন্তু নীরবের কোনো চিহ্ন নেই। তাকে কিছু না বলে, হুট করেই কোথায় চলে গেল নীরব? তবে কি সত্যিই সে জারিনের জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল?

জারিনের দুই চোখ দিয়ে শ্রাবণের ঢল নামছে। ভয়ার্ত মন নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তার খেয়াল হলো, বিকেলের নরম আলো মিলিয়ে গিয়ে চারপাশ কখন

যেন ঘন পিচকালো অন্ধকারে ডুবে গেছে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, যেন এই স্থানটায় সে ছাড়া আর কখনো কেউ ছিল না। একাকীত্ব আর ভয়ে চুপসে যায় সে। দাঁড়িয়ে না থেকে সে হাঁটতে শুরু করে, নিজেকে একটু সাহস দেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক তখনই, কোথা থেকে যেন এক ভয়ঙ্কর বিশাল প্রেতাত্মা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। জারিনের কলিজা শুকিয়ে যায়! নিজেকে বাঁচাতে পেছন ফিরেই জানপ্রাণ দিয়ে ছুটতে শুরু করে সে।

সেই ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মার তাড়া খেয়ে পথ হারিয়ে জারিন দৌড়াচ্ছে রুদ্ধশ্বাসে। ক্রমেই তার আর সেই ডাইনির মধ্যকার দূরত্ব কমে আসছে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখে এবং এক ঝটকায় তাকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে এনে ঘাড়ের কাছে কামড় বসিয়ে দেয়।

'বাঁচাও!' বলে চিৎকার করতে করতেই জারিনের ঘুম ভেঙে যায়। কনকনে শীতের মধ্যেও ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে তার পুরো শরীর।

শীতের শেষ রাত, সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা সবকিছু ছেয়ে রেখেছে। ঘন কুয়াশায় মোড়া পৃথিবী যেন এক ধোঁয়াশায় মোড়া উনুনঘরে পরিণত হয়েছে। চারপাশ এতটাই নিস্তব্ধ যে, দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসা আযানের সুর বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মুয়াজ্জিন তার কণ্ঠের সবটুকু মায়া ঢেলে দিয়ে আরামে ঘুমিয়ে থাকা মুসলমানদের ডাকছেন,

হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ...

কল্যাণের পথে এসো, কল্যাণের পথে এসো...।

নাজমা বেগম জায়নামাজে বসে এক মনে তাসবীহ পড়ছেন। জারিনের ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ হলো, কিন্তু আযানের সুর তাকে এখনো পুরোপুরি বাস্তবে আনতে পারেনি। স্বপ্নের ভয়াবহতার ঘোর তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। টিনের চালে ঝরে পড়া কুয়াশার টুপটাপ শব্দ শুনতে শুনতে সে আরও কিছুক্ষণ স্বপ্নটা নিয়ে ভাবতে লাগল।

এসব কী দেখল সে? এত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন কেনই বা দেখল?

রাজ্যের এলোমেলো চিন্তায় ভীষণ অস্থিরতা তাকে গ্রাস করল। জারিন ভাবল, কোনোভাবে সকাল হলেই সাধ্যমতো সাদকা করে দেবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করল, 'ইয়া রাব্বি, আপনি আমাকে স্বপ্নের ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন'।

'কীরে জারিন, এভাবে হাঁপাচ্ছিস কেন?' জারিনের মা তাকে ধড়ফড় করে উঠে বসতে দেখে জানতে চাইলেন।

'মা, একটা দুঃস্বপ্ন দেখে খুব ভয় পেয়েছি। স্বপ্নে দেখি একটা রাক্ষুসি প্রেতাত্মা...'

'যা দেখেছিস ভালোই দেখেছিস, খারাপ স্বপ্নের কথা বলতে হবে না। আযান দিয়েছে, শুনেছিলি? নামাজ পড়েছিস?'

'না, মা। আজকে তাহাজ্জুদ পড়তে পারিনি।' মন খারাপ করে বলল জারিন। ইদানীং প্রায়ই তাহাজ্জুদ ছুটে যাচ্ছে তার। জারিনের মনে হল, সে কি নিজের অজান্তে কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়েছে? না, তার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না। সে সচেতনভাবে কখনো নামাজ কাজা করে না, তেমনি ইচ্ছেকৃতভাবে কোনো গুনাহেও লিপ্ত হয় না। সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যেন অজান্তেও কোনো ভুল না হয়ে যায়। যদি কোনো ভুল হয়েও থাকে, তাহলে সবসময় আল্লাহর দরবারে তাওবা করে। তাহলে কেন তিনি বারবার তাহাজ্জুদের রহমত থেকে তাকে বঞ্চিত হচ্ছেন? নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে তার। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না সে। আরও সচেতন হয়ে তাকে আমল করতে হবে, আল্লাহ্‌র কাছে রহমতের ভিক্ষা চাইতে হবে।

আজকাল শরীরও ভালো নেই তার। প্রেগন্যান্সির এই সময়টায় রাতে জারিনের ঘুমও কম হয়। আবার একবার ঘুম এলে সহজে তা ভাঙতে চায় না। জারিন ভাবে, না, যেভাবেই হোক, কাল থেকে তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করতে হবে। ঘুম আসার আগেই এলার্ম দিয়ে মোবাইলটা হাতের নাগালের বাইরে রাখতে হবে যাতে সহজে ঘুমের ঘোরে এলার্ম বন্ধ করতে না পারে।

'নামাজ না পড়ে বসে আছিস কেন? বিছানা থেকে উঠে যা এবার।'

জারিন এলোমেলো ভাবনা থেকে মায়ের ধমকে বাস্তবে ফিরে আসে। এই ভোর রাতেও মায়ের কণ্ঠে কোনো কোমলতার ছোঁয়া নেই। মা অবশ্য কোনোদিনই কোমল ভাষী ছিলেন না তার সাথে। সবসময় একরাশ বিরক্তি যেন তাকে ঘিরে

রাখে। জারিন আগে বিরক্ত হয়ে মায়ের কথার প্রতিবাদ করত, ধমক খেয়ে নিজেও উল্টো ধমক দিত। কিন্তু দ্বীনের পথে ফেরার পর থেকে মায়ের মুখে মুখে তর্ক করে না। রাব্বে কারিম যেখানে মায়ের সাথে সামান্য 'উফ' শব্দ ব্যবহার করতে মানা করেছেন, সেখানে সে কীভাবে তর্ক করতে পারে?

জারিন নিজে এখন মা হওয়ার বন্ধুর পথটা পাড়ি দিচ্ছে। এখন সে বুঝতে পারে, তার মা এমন কঠোর হয়েছেন তার ভালোর জন্যই। মায়ের কষ্ট উপলব্ধি করার চেষ্টা করে সে। জারিনের জন্মের পর থেকেই তার বাবা নিরুদ্দেশ। দুবাই গিয়েছিলেন এক লোকের সাহায্যে, প্রথম চার-পাঁচ বছর মাসে ছয়মাসে খবর নিতেন। টাকাপয়সাও পাঠাতেন। কিন্তু এখন তার কোনো খোঁজখবর নেই। বেঁচে আছেন না মরে গেছেন আল্লাহই জানেন। তবে কেউ কেউ বলে, জারিনের বাবা সেখানে আবার বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছেন। দেশে থাকা সব স্বজনদের ভুলে গেছেন, এমনকি নিজের সন্তানদেরও।

জারিনের মা অনেক কষ্ট করে দুই ভাইবোনকে মানুষ করেছেন। নিজে না খেয়ে, গায়ের রক্ত পানি করে ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে বড় করেছেন। জারিনের এখনো মনে পড়ে, তার বড় ভাইয়া ছোটবেলায় কত পাগলামি করত—'এটা খাবে না, ওটা খাবে না' বলে। জারিন ছোট হয়েও বুঝত, বাবা নেই বলে মায়ের এসব জোগাড় করতে খুব কষ্ট হয়। তাই সে কখনো মায়ের কাছে কিছু চাইত না। ভাইয়াকেও বোঝানোর চেষ্টা করত। কিন্তু এতে লাভ হতো না। উল্টো ভাইয়ের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসত কাঁদতে কাঁদতে। ভাই-বোনের এই খুনসুটিগুলোই ছিল তাদের ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। জারিফ ভালো খাবারের জন্য পাগল ছিল, কিন্তু বড় ভাই হিসেবে জারিনের প্রতি তার ভালোবাসার অভাব ছিল না। অভাব-অনটনের সংসারে তবু চাওয়া-পাওয়ার হায় হুতাশে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে জারিনের থেকে জারিফ যেন অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। হয়তো মেয়ে বলে সংসারের মায়া ছোট থেকেই আঁকড়ে বেঁচে থাকতে শিখে গিয়েছিল।

জারিনের মন ভারী হয়ে আসে। কোথায় আছে তার আদরের ভাইয়া এখন? ছোটবেলায় কতশতবার তাকে কাঁধে চড়িয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে আসতো, পেয়ারা বড়ই পেড়ে দিত! কতদিন হলো ভাইয়ার কোনো খোঁজখবর নেই। সেই যে বন্ধুর সাথে কোন এক ইসলামি সমাবেশে যোগ দিতে ঢাকায় গেল তারপর আর কোনো খবর নেই। কী ঘটেছিল সেদিন তাদের সাথে, তা কেবল দয়াময় রব

জানেন। অনেক খুঁজেও জারিন আর তার মা জারিফের কোনো হদিশ পাননি। পথে কোনো দূর্ঘটনা হয়েছিল কী না সেটাও জানা যায়নি। ঢাকার বড় হাসপাতালগুলোতে, থানায়, মর্গে' সম্ভাব্য সব জায়গা খুঁজেছেন তারা। জারিনের মা এখনো মাঝরাতে উঠে ছেলের জন্য বিলাপ শুরু করেন। একমাত্র ছেলে হারানোর কষ্ট তাকে আরও পাথর করে দিয়েছে। কিন্তু জারিনের মায়ের বিশ্বাস, তার ছেলে এখনও বেঁচে আছে। একদিন না একদিন অবশ্যই তার আদরের ধন তার বুকে ফিরে আসবে। দুঃখিনী মাকে ফেলে কতদিন আর সে এভাবে দূরে থাকবে?

তবে জারিনের ধারণা, তার ভাইয়া আর বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে কোনো না কোনোভাবে তার খোঁজ ঠিকই পাওয়া যেত। হয়তো নিজেই তাদেরকে খুঁজে নিতো। ভুলিয়ে দিত এতদিনের যত হাহাকার। তবুও সে সবসময় দোয়া করে যায়, যেখানেই থাকুক আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যেন তার ভাইয়াকে ভালো রাখেন, হায়াতে তাইয়্যেবাহ দান করেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা ছেড়ে দুই হাত দিয়ে চোখ থেকে ঘুমের চিহ্ন মুছতে মুছতে ঘুম থেকে ওঠার দোয়া পড়ে বিছানা থেকে সাবধানে নেমে যায় জারিন।

নাজমা বেগম আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, মা শা আল্লাহ এই বয়সেই মেয়েটা সুন্নাহর প্রতি কতটা যত্নবান। অথচ তিনি এই বয়সে ভালো করে নামাজটাও পড়তেন না। বাবা-মায়ের অতি আদরের ছোট মেয়ে হলে যা হয় আরকি। আদরে আদরে বাদর হয়ে গিয়েছিলেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর তার দূরন্তপনা আরও বেড়ে গিয়েছিল। নিজের খেয়ালখুশি মতো চলতেন, কলেজ শেষেও বান্ধবীদের সাথে এখানে সেখানে ঘুরে ফিরতেন সেই মাগরিবের সময়ের পরেও। তার মা ভাবতেন, মেয়ে বুঝি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত খুব। সারাদিন ক্লাস করে এসেছে ভেবে খুশিতে নিজ হাতে ভাত মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন। সারাদিনের নামাজ দূরে থাক, মাগরিবের নামাজ পড়ার তাড়াও মেয়েকে দিতেন না। যেন নামাজটা সেকেলে একটা জিনিস। নামাজ তো তিনি পড়েনই, তার শিক্ষিত মেয়ের পড়ার দরকার কী? কত স্বপ্ন ছিল তার মায়ের, মেয়েকে ডাক্তার বানাবেন। কিন্তু মেয়ে যে ভেতরে ভেতরে প্রেম নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বসে আছে কে জানত? তাও আবার কলেজের লাইব্রেরিয়ানের সাথে! যখন টের

পেয়ে মেয়েকে সামলাতে গেলেন, দেরি হয়ে গেছে অনেক। সুতো কাটা ঘুড়ির তখন কি আর চাইলেই নাগাল পাওয়া সম্ভব?

নাজমা বেগমের চোখ ভিজে আসে সেসব দিনের কথা ভাবতে ভাবতে। একদিন তিনি বাবামায়ের কথা একবিন্দুও না ভেবে প্রেমের মোহে অন্ধ হয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন জহির আহমেদের হাত ধরে। কে জানত গ্রামের এই ছেলেটির থাকার উপযোগী একটা ঘর পর্যন্ত নেই। চলাফেরা আর কথাবার্তার স্টাইল দেখে যার প্রেমের ঘোরে পড়ে সব ছেড়ে এসেছিলেন, তার সেই সেই ঘোরটা কেটে গিয়েছিল বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই। কাজী অফিসে বিয়ে করে এখানে সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে যখন তারা গ্রামে আসতে বাধ্য হয়, তখন তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল।

বাবার করা কেইসের কারণে জহিরকে চাকরি থেকেও বরখাস্ত করে দেয়া হয়েছিল। থানা পুলিশ করতে করতেই কেটে গিয়েছিল বিয়ের দুইটা বছর। বছর না ঘুরতেই একদিকে জারিফের জন্ম আর অন্যদিকে শ্বাশুড়ি ননদের হাতে দিনরাত মানসিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জীবনটা নরকে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তার। যে মেয়েটাকে তার মা মুখে তুলে খাইয়ে দিত একটা সময়, সময়ের পরিক্রমায় তাকেই দশ বারোজনের বিশাল সংসারের রান্নাবান্না থেকে সব কাজ সেরে খেতে বসতে হতো তাও সবার শেষে। শেষদিকে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, একবার তিনি আর সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছিলেন বাবার বাসায়। কিন্তু গিয়ে দেখেন, বাবার সেই ভাড়া বাসায় এখন অন্য ফ্যামিলি থাকে। লোকলজ্জার ভয়ে তার বাবা-মা অনেক আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু তারা কোথায় গেছেন কেউ জানে না। বাধ্য হয়ে সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে তাকে আবার নরকেই ফিরে আসতে হয়েছিল সেদিন। ফেরার পর জহিরের হাতে মার খেয়ে তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননি। মনে প্রাণে দোয়া করেছিলেন, যেন এই যাত্রায় মরে গিয়ে বেঁচে যান। কিন্তু তার পাপের বোঝা হয়তো অনেক বেশি ছিল। তাই তার প্রায়শ্চিত্তও এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়নি। তিনদিনের দিন কোনোমতে কোমর সোজা করে উঠে সব কাজ বাধ্য হয়ে তাকে শুরু করতে হয়েছিল, আবারও।

দুঃখভরা সেই অতীত ভাবতে ভাবতে নাজমা বেগমের বুকের গভীর থেকে অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তার বাবা-মা আর একটু সচেতন হলে,

ছোট থেকে তাকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করলে হয়তো তার আজকের এই অবস্থা হতো না। না পেয়েছেন তিনি দুনিয়া, আর না পেয়েছেন আখিরাত। যদিও তিনি এখনো আশাবাদী, আখিরাত নিয়ে। কিন্তু আফসোস, তার যৌবনটা তো শয়তানের দাসত্ব করেই কেটেছে। অথচ যৌবনের ইবাদতই মহান রবের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাও শুকরিয়া যে, মেয়ের মাধ্যমে তিনি দ্বীনের বুঝ পেয়েছেন এই বয়সে এসে হলেও। মেয়েকে তার বাবার কথা শুনে স্কুলে দিলেও মেয়ে ক্লাস ফাইভে উঠে একপ্রকার জোর করেই নিজে থেকে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এটাও একটা আল্লাহর রহমতই ছিল হয়তো বা। ছেলেটাও তো আর তার বুকে ফিরে এলো না। এখন একমাত্র এই মেয়েটাকে নিয়েই তিনি স্বামীর ভিটা কামড়ে পড়ে আছেন। যদিও স্বামী নামক মানুষটির সাথে অনেক বছর হলো তার আর যোগাযোগ নেই। কোথায় আছে মানুষটা? আদৌ কি বেঁচে আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই তার।

নাজমা বেগম এটা সেটা ভাবতে ভাবতে রাব্বে কারিমের কাছে দুই হাত পেতে মোনাজাত করতে শুরু করেন। বিড়বিড় করে মনের ক্ষতগুলো তার কাছে পেশ করতে থাকেন।

জারিন ওজু করে এসে দেখে, মা মুনাজাত করতে করতে কাঁদছেন। মনটা তার প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। মা মাঝে মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথেও কেমন যেন অভিমান করে বসে থাকেন। বলেন, 'করব না আর দোয়া। কী হবে দোয়া করে? আমার দোয়া কি তিনি শোনেন? শুনলে আমার একমাত্র ছেলেটাকেও কেন আমার বুক থেকে কেড়ে নিলেন তিনি?' এত অভিমান বুকে জমিয়ে তিনি ভুলে যান কার সাথে অভিমান করছেন। জারিন আনমনে এও ভাবে, আল্লাহ পাক ছাড়া কেই বা আমাদের কষ্টগুলো খুব করে বোঝে! তাই মাকে আর শান্ত করতে যায় না। পৃথিবীর বুকে সহায় ও অসহায়ের একমাত্র আশ্রয়স্থল তিনি। সুবহান আল্লাহ।

এক সময় জারিন শান্ত মেজাজে মাকে বুঝাতে থাকে, মুমিনের দোয়া কখনও বৃথা যায় না। কোনো কোনো দোয়া কবুল না হওয়াতেই হয়তো কল্যাণ লুকিয়ে থাকে। কখনো কখনো দোয়ার কারণে তিনি বান্দার বড় কোনো বিপদ কাটিয়ে দেন আর যেসব দোয়া কবুল হয় না, সেসবের প্রতিদান জান্নাতে তো দেয়া হবেই ইন শা আল্লাহ।

নাজমা বেগম চুপচাপ মেয়ের কথা শুনে যান। আর মনে মনে ভাবেন, রাব্বে কারিমের সাথে অভিমান করলে কি গুনাহ হবে? তিনি ছাড়া এতটা আপন, এতটা কাছের কে আছে আর? আবার ভাবেন, রাব্বে কারিম তো তাকে সৃষ্টি করেছেন, রিজিক দিচ্ছেন, অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তার সাথে অভিমান করে পারে কেউ? কথাগুলোর সাথে এক অজানা ভাবনা দলা পাকিয়ে ওঠে গলার মধ্যে।

জারিন নামাজ শেষ করে সকালের আমলগুলো করে আবারও লেপের ভেতর ঢুকে যায়।

'কী রে আবার শুয়ে পড়লি যে?'

'একটু পর উঠে যাব। শরীরটা ভালো লাগছে না তেমন।'

'জামাই আসবে আজকে? কথা বলেছিলি?

'না আমাকে জানায়নি কিছু, আমিও কল দিইনি।'

'কল দিসনি কেন তুই?'

'কীসব বলছো মা? আমি কেন নিজে থেকে লোকটাকে কল দেব?'

'লোকটা মানে আবার কী? এভাবে বলছিস কেন? সে তোর স্বামী না?'

'স্বামী স্বামী কইরো না তো মা, বিরক্ত লাগে। খুব বলেছিলে না, দ্বীনদার ছেলে, বিয়ে করে নে, বিয়ে করে নে। এখন বুঝতে পারছো, কেমন দ্বীনদার সে? লম্পট একটা।' জারিনের চোখমুখে একরাশ বিরক্তি ফুটে ওঠে।

'এমন করিস না মা, কল দিয়ে ওকে আসতে বল।'

'হ্যাঁ, আমাকে পাগলে পেয়েছে তো। তাকে কল দিয়ে বলব, আমাকে নিয়ে যান এসে, আপনাকে ছাড়া আর থাকতে পারছি না!'

'মেয়েমানুষ হয়ে এত কীসের অহংকার তোর? আমি পারব না তোকে এখানে বসিয়ে বসিয়ে আর খাওয়াতে। আর যৌবনকালে পুরুষমানুষ এমন করেই টুকটাক। মেনে নিলেই তো হয়। এই বয়সে নারীর প্রতি, মদ-জুয়ার প্রতি কিছুটা আকর্ষণ থাকতেই পারে। কিন্তু তাতে কী? তারা কি মেয়ে মানুষ যে, একটুতেই চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে?'